যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নয় দফা কর্মসূচি 'নবপদী' রূপায়ণ করুক সরকার

সীতারাম ইয়েচুরি

শুধুমাত্র এক ঐক্যবদ্ধ ভারতই পারবে এই মরণ-বাঁচন যুদ্ধে জয়লাভ করতে। এই লড়াইয়ের পাশাপাশি যদি মানুষকে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভাজিত করা চলতে থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা যুদ্ধের আগেই হেরে বসে থাকব। দেশে বর্তমানে যেভাবে সাম্প্রদায়িক ও বিভাজনকর প্রচার চলছে, সংখ্যালঘুদের সামাজিক বয়কটের ঘটনা ঘটছে, তাদেরকে কোণঠাসা করে ঘৃণা ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে তোলা হচ্ছে, তাতে আশা করা গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এই প্রবণতার নিন্দা করবেন ও দেশবাসীকে জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে শামিল হতে আহ্বান জানাবেন। কিন্তু নিন্দা তো দূরের কথা, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে এই বিষয়ের কোনো উল্লেখই ছিল না

তিন সপ্তাহ তালাবন্দির শেষ দিনে গত ১৪ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী কী বলেন, তার দিকে সবার নজর ছিল। এই তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতায় কোভিড-১৯ মহামারির মোকাবিলায় এবং কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের জীবন রক্ষায় আমাদের কী করা উচিত তার একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে। কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলির কোনোটির উপরেই প্রধানমন্ত্রী তেমনভাবে আলোকপাত করলেন না। যার ফলে মূল সমস্যার সমাধানে কীভাবে দেশ এগিয়ে যাবে, সে বিষয়ে মানুষের আস্থা বাড়াতে একপ্রকার ব্যর্থই হল প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণ।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, এই তালাবন্দি আরো ১৯ দিন, অর্থাৎ ৩ মে পর্যন্ত চলবে। তিনি বললেন, ১৫ এপ্রিল তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু নির্দেশিকা জারি করেছিল, এরপর আবার ২০ এপ্রিল তারিখে মহামারি সংক্রমণের হটস্পটগুলি চিহ্নিত করার বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে। তিনি জানালেন,হটস্পটের বাইরের এলাকায় নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করা হবে। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা কতটুকু শিথিল করা হবে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হবে কিনা, মানুষের জীবিকার্জনের পথ খোলা হবে কিনা, সে সম্পর্কে কিছুই বললেন না।

মহামারির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ ও তীব্র লড়াই চাই

এই লড়াইকে তীব্রতর করতে হলে যে দুটো বিষয়ে অতিদ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কার্যত নীরব রইলেন। এই দুটি বিষয় হল— (১) চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের (Personal Protective Equipment বা PPE) জোগান দেওয়া, এবং (২) মানুষের মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় সংক্রমণ নির্ণয়ের পরীক্ষা করা।

এই জরুরি বিষয়ে কিছু জানানোর পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে অতিদ্রুত তালাবন্দি ঘোষণার জন্য নিজেই নিজেকে বাহবা দিলেন। তিনি বললেন, অতিদ্রুত তালাবন্দি জারি করার জন্যই দেশে সংক্রমণের গতি অনেকটা কম হয়েছে। বাস্তবে ২৪ মার্চ তারিখে মাত্র ৪ ঘণ্টার নোটিশে সারা দেশে তালাবন্দি ঘোষণা করা হয়, যার জন্য রাজ্য সরকার থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই চরম অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়।

ভারতের করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রথম ঘটনাটি সনাক্ত হয় ৩০ জানুয়ারি তারিখে। তা সত্ত্বেও এর পরের সাত সপ্তাহ ধরে সরকার কার্যত শীতঘুমেই আচ্ছন্ন ছিল। সমস্ত কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবে চলেছে, সংসদ অধিবেশন চালিয়ে যাওয়া হয়েছে, মধ্যপ্রদেশের নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এরপর আবার ২২ মার্চ জানতা কার্ফ্যুর প্রাক্কালে ঐ রাজ্যে নতুন বি জে পি সরকারের শপথগ্রহণ সমারোহও সম্পন্ন করা হয়েছে। এক জায়গায় বহু মানুষের জড়ো হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এই সব কর্মসূচী বন্ধ রাখা হয়নি।

তালাবন্দির কথা বলতে গেলে বিশ্বের বহু দেশেই অনেক দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। চীনের উহানে তালাবন্দি ঘোষণা করা হয় ২৩ জানুয়ারি থেকে, পুরো ইতালিতে তালাবন্দি জারি করা হয় ১০ মার্চ থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি হয় ১৩ মার্চে, স্পেনে ১৪ মার্চ, ফ্রান্সে ১৭ মার্চ এবং ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে ২৩ মার্চ। সুতরাং ভারত অতিদ্রুত তালাবন্দি ঘোষণা করেছে, প্রধানমন্ত্রীর এই দাবি ধোপে টেকে না।

কেরালা থেকে অভিজ্ঞতা নেওয়া উচিত ছিল

কেরালার বাম গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকার ইতিপূর্বে সাফল্যের সঙ্গে নিপাহ্ ভাইরাস সংক্রমণকে প্রতিহত করেছে, এই সাফল্যের স্বীকৃতি এবং প্রশংসা এসেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে। এবারেও কেরালা সরকার করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে ক্ষিপ্র পদক্ষেপ করেছে। অন্যান্য দেশ থেকে খবর পাওয়ামাত্র কেরালা প্রস্তুতি নিতে শুরু করে এবং সেটা শুরু হয়ে যায় ৩০ জানুয়ারি দেশের প্রথম সংক্রমণ সনাক্ত হবার অনেক আগে থেকেই। এর একটা কারণ হল এই রাজ্যের বহু মানুষ বিদেশে, এমন কি চীনেও বসবাস করেন অথবা লেখাপড়া করেন। তারা যখন ঘরে ফিরবেন, স্বাভাবিকভাবেই ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে ফেরার সম্ভাবনা থাকতে পারে। তাই সংক্রমণের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য রাজ্য ও জেলাস্তরে অতিদ্রুত কন্ট্রোল রুম তৈরি করা হয়। এর পরে কেরালা সরকার কী কী পদক্ষেপ করেছে তা বিস্তারিতভাবে বহুবার আলোচনা হয়েছে, তাই পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই। তবে সেই সব প্রয়াসের নীট ফলটা হল এই যে, সারা দেশের মধ্যে কেরালাই একমাত্র রাজ্য যেখানে সংক্রমণ বিস্তারের লেখচিত্র প্রায় অনুভূমিক করে ফেলা সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন ভারতে নাকি অনেক আগে থেকেই বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের পরীক্ষা করার কাজ শুরু হয়েছিল। যদি তাই হয়ে থাকে তবে ইতালিয়ান পর্যটকেরা সংক্রামিত অবস্থায় কী করে দেশে ঢুকতে পারল? উল্লেখ্য সেই পর্যটকেরা পরবর্তী সময়ে সংক্রমণ নির্ণয়ের পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েছেন। এক নামীদামী সঙ্গীতশিল্পী বিদেশ থেকে ফিরলেন, বিমানবন্দর থেকে এসে বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা শুরু করলেন, এবং পরে সংক্রামিত বলে চিহ্নিত হলেন। তার সঙ্গে যারা পার্টি করলেন (তাদের মধ্যে অনেকেই বি জে পি দলের কেষ্টবিষ্টু), তাদেরকে নিভৃতবাসে রাখতে হল। এরকম আরো বহু উদাহরণ রয়েছে। এই ঘটনাগুলি প্রধানমন্ত্রীর দাবির সঙ্গে একেবারেই মেলে না।

প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন ভারতে নাকি পর্যাপ্ত পরিমাণে সংক্রমণ নির্ণয়ের পরীক্ষা করা হচ্ছে। রোগবিস্তারের কেন্দ্রবিন্দুকে চিহ্নিত করে সংক্রামিতদের অতিদ্রুত আলাদা করতে গেলে এই পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রচুর সংখ্যায় পরীক্ষা না করতে পারলে গোষ্ঠী সংক্রমণ ঠেকানো কার্যত অসম্ভব। কিন্তু পরীক্ষা যদি অতি অল্প সংখ্যায় করা হয়, তাহলে তো হাতে সুনির্দিষ্ট তথ্যই থাকবে না। তখন একদিকে যেমন সংক্রমণের কেন্দ্রস্থল চিহ্নিত করা যাবে না, অন্যদিকে রোগবিস্তার প্রতিহত করাটাও অসম্ভব হয়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রী যেমনটা দাবি করেছেন, তা কি সত্যি? ভারতে কি সত্যিই পর্যাপ্ত সংখ্যায় পরীক্ষা করা হচ্ছে? আমরা আগেও বলেছি সারা বিশ্বে যেসব দেশে সবচেয়ে কম হারে পরীক্ষা করা হচ্ছে, ভারতের অবস্থান সেই সব দেশের মধ্যে। দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় ভারতে ২৪১ ভাগ কম হারে পরীক্ষা করা হচ্ছে। ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ভারতে পরীক্ষার হার ছিল প্রতি হাজার মানুষে মাত্র ০.০৯২, অথচ ওই সময়ে জার্মানির হার ছিল ১৫.৯৬, ইতালির ১৪.৪৩, অস্ট্রেলিয়ার ১২.৯৯, ডেনমার্কের ১০.৭৩, কানাডার ৯.৯৯। বিশ্বের কয়েকটি দেশে সংক্রমণ নির্ণয়ের পরীক্ষার হার কবে কেমন ছিল, তার একটা সারসংক্ষেপ দেওয়া হল সঙ্গের

সারণিতে।

সারণি: সংক্রমণ নির্ণয়ের পরীক্ষার হার প্রতি দশ লক্ষ মানুষে

দেশ	২৪ মার্চ	৩ এপ্রিল	১৩ এপ্রিল
ইজরায়েল	৩,৯০০	১১, ৭০০	১৮,৬০০
ইতালি	৪,৯১৫	১০, ২৫৯	১৭,৩২৭
অস্ট্রেলিয়া	৫,৬০০	১০,৯০০	১৪,৩০০
দঃ কোরিয়া	৬, ৭৫১	৮,৫৮৫	১০,০৪৬
বেলজিয়াম	২,৯৭৪	৬,৩১৫	১০,০৪২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১,০৫৪	৪, ২৭০	৮,৯৭১
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	১,৩৬১	২, ৬১৫	৪,৩৭৪
মালয়েশিয়া	৭০০	১,৩০১	২,৫০০
ইক্যুয়েডর	২০০	৬০০	১,৪০০
দঃ আফ্রিকা	৩০০	৯০০	১,৪০০
পাকিস্তান	২৮	২০০	৩০০
ভারত	১৭	৫১	১৬১

জনকল্যাণকর পদক্ষেপ চাই

এই নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত এই রোগে ১১, ৪৭৯ জন পজিটিভ হয়েছেন, এবং ৩৯০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এর পাশাপাশি রোগ ছাড়া অন্য কারণে (যেমন অনাহারে, অত্যধিক ক্লান্তি ও অবসাদে এবং আশ্রয় না থাকার কারণে) এখন পর্যন্ত ২০০-রও বেশি মানুষ মারা গেছেন। এই হারে মৃত্যু ভারতের জন্য অবাঞ্ছিত। বস্তুত যে কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যুই অবাঞ্ছিত। তবে রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি আমাদের এটাও সুনিশ্চিত করতে হবে যে, অনাহার মৃত্যুর ঘটনা যেন একটিও না ঘটে। আর সেজন্যেই আয়কর দিতে হয় না এমন পরিবারগুলির কাছে অনতিবিলম্বে ৭,৫০০ টাকা করে এককালীন নগদ হস্তান্তর করা প্রয়োজন। পাশাপাশি অভাবগ্রস্ত পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেবার ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত জরুরি। এই প্রস্তাব রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

রাজ্যের আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি কর

কেন্দ্রীয় সরকার ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার যে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, তা ভীষণভাবে অপর্যাপ্ত। এই পরিমাণ অর্থ দেশের জি ডি পি-র মাত্র ০.৮ শতাংশ। মালয়েশিয়ায় যে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে, তা ঐ দেশের জি ডি পি-র ১৬ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাকেজ ঐ দেশের জি ডি পি-র ৯ শতাংশেরও বেশি, জার্মানির ক্ষেত্রে ৮ শতাংশেরও বেশি, ইতালির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশেরও বেশি। ঐসব দেশের তুলনায় ভারতের প্যাকেজ একেবারেই অকিঞ্চিৎকর, মানুষের জীবন রক্ষার জন্য একেবারেই অপর্যাপ্ত। মানুষের স্বার্থে এমন অপর্যাপ্ত প্যাকেজ ঘোষণা করা সরকারের পক্ষে হীন অপরাধের শামিল। অনতিবিলম্বে এই আর্থিক প্যাকেজের পরিমাণ বাড়িয়ে জি ডি পি-র ৫ শতাংশে তুলে নিতে হবে। মহামারির বিরুদ্ধে মূল লড়াইটা লড়তে হচ্ছে রাজ্যকে। কিন্তু রাজ্যের হাত মজবুত করা তো দূরের কথা, তাদের ন্যায্য পাওনা অর্থ থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটা চলতে পারে না। রাজ্যের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ না থাকলে আমরা কার্যকরী লড়াই লড়তে পারব না। প্রধানমন্ত্রীর নামাঙ্কিত যে তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে, তা অতিশীঘ্র রাজ্যের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এর পাশাপাশি এই সংকটকালে রাজ্যগুলি যাতে কেন্দ্রের বেঁধে দেওয়া উর্ধ্বসীমার বাইরেও ঋণ গ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার।

কর্মসংকোচন

গত ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, কাউকে যেন কর্মচ্যুত না করা হয়। এরপরেও তিনি নিয়োগকর্তাদের কাছে এই আবেদনটুকু রেখেছেন। কিন্তু এই ধরনের আবেদনে যে কাজ হয় না এবং বাস্তবিক পক্ষে হয়ওনি, তা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েক হাজার স্থায়ী কর্মী কর্মচ্যুত হয়ে গেছেন। সমস্ত দৈনিক হাজিরার কর্মী, ঠিকা এবং অস্থায়ী কর্মী কাজ থেকে ছাঁটাই হয়ে গেছেন। তালাবন্দির সময়ে ব্যাপক হারে মজুরি ছাঁটাই চলছে। বেশির ভাগ দেশে কর্মীদের কাজ ও মজুরি যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। অনেক দেশেই কর্মীদের মজুরির অধিকাংশ, কোথাও কোথাও ৮০ শতাংশ পর্যন্ত সরকার বহন করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু ভারত সরকার এখন পর্যন্ত এই দিশায় কিছুই করেনি। অতিদ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা দরকার, না হলে মানুষের দুর্দশা বাড়বে বই কমবে না।

গ্রামীণ অঞ্চলের সংকট

এখন ফসল কাটার মরসুম। কৃষকের কাছ থেকে স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সি২ + ৫০ শতাংশ সহায়ক মূল্যে যাতে কৃষিপণ্য সংগ্রহ করা হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এম এন রেগা প্রকল্পে কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে বলে যা খবর আসছে তা কিন্তু উদ্বেগজনক। জবকার্ডধারীদের অতিশীঘ্র মজুরি প্রদান করা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ২০ এপ্রিল পরবর্তী পর্যালোচনা করা হবে এবং তার ভিত্তিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তালাবন্দি শিথিল করা হতে পারে। ঐ সময়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে যথাযথ বন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যক। এই পরিযায়ী শ্রমিকেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে আটকা পড়ে খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে প্রচণ্ড কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। কেরালাতে অবশ্য মানুষের সহায়তা নিয়ে রাজ্য সরকার তাদের দেখাশোনায় খুব ভাল কাজ করছে, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে এই সব শ্রমিকেরা দুর্বিষহ অবস্থায় রয়েছেন। উল্লেখ্য, বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনতে ভারত যে সময়োপযোগী ও অতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে, ঠিক একইরকম ভাবে বিশেষ ট্রেন ও বাসের ব্যবস্থা করে এই সব পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা সম্ভব। সম্ভাব্য গোষ্ঠী সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য এই পদক্ষেপ আরো বেশি জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশিকা জারি হবে বলে বলেছেন, তাতে এই সমস্ত বিষয়গুলির সুষ্ঠু সমাধানের প্রয়াস থাকবে, এমনটা আশা করলে হয়তো অনেক বেশি আশা করা হয়ে যাবে। কিন্তু উপরে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি সংক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই এবং মানুষের জীবন জীবিকা সুরক্ষার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না।

সবশেষে বলতে চাই, শুধুমাত্র এক ঐক্যবদ্ধ ভারতই পারবে এই মরণ-বাঁচন যুদ্ধে জয়লাভ করতে। এই লড়াইয়ের পাশাপাশি যদি মানুষকে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভাজিত করা চলতে থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা যুদ্ধের আগেই হেরে বসে থাকব। দেশে বর্তমানে যেভাবে সাম্প্রদায়িক ও বিভাজনকর প্রচার চলছে, সংখ্যালঘুদের সামাজিক বয়কটের ঘটনা ঘটছে, তাদেরকে কোণঠাসা করে ঘৃণা ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে তোলা হচ্ছে, তাতে আশা করা গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এই প্রবণতার নিন্দা করবেন ও দেশবাসীকে জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে শামিল হতে আহ্বান জানাবেন। কিন্তু নিন্দা তো দূরের কথা, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে এই বিষয়ের কোনো উল্লেখই ছিল না। অথচ এটা বাস্তব যে, কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্যই আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য সাত- দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে বলেছেন, প্রতিটি দেশবাসী যেন এই ' সপ্তপদী' পালন করে চলে। পাশাপাশি, সরকার তার নিজের জন্য উপরে উল্লিখিত বিষয়ে দফাওয়ারি কর্মসূচী ঘোষণা করবে এবং তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে, এটাও কাম্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য আমরা এক নয় দফা কর্মসূচী বানিয়েছি। সংক্রমণের বিরুদ্ধে মজবুত লড়াই চালাতে হলে এবং মানুষের জীবন জীবিকা রক্ষা করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই 'নবপদী' কর্মসূচী রূপায়ণ করা উচিত। এই ' নবপদী' কর্মসূচী নিচে দেওয়া হল—

(১) প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পি পি ই) সংগ্রহ করে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সরবরাহ করতে হবে।

(২) অতিদ্রুত সংক্রমণ নির্ণয়ের পরীক্ষা বাড়াতে হবে।

(৩) যেসব পরিবারে আয়করদাতা নেই, সেসব পরিবারে ৭,৫০০ টাকা নগদ হস্তান্তর করতে হবে।

(৪) সমস্ত অভাবগ্রস্ত পরিবারে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে হবে।

(৫) আর্থিক প্যাকেজকে জি ডি পি-র ০.৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে কমপক্ষে জি ডি পি-র ৫ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে।

(৬) রাজ্য সরকারের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের বন্দোবস্ত করতে হবে।

(৭) কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সি২ + ৫০ শতাংশ সহায়ক মূল্যে সংগ্রহ করতে হবে। পাশাপাশি সকল এম এন রেগা শ্রমিককে মজুরি দিতে হবে, কাজ হোক বা না-ই হোক।

(৮) কর্মীদের কাজ ও মজুরি সুরক্ষায় নিয়োগকর্তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দিতে হবে।

(৯) অতিদ্রুত পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে।

(সৌজন্য ঃ পিপলস ডেমোক্রেসি ১৩-১৯ এপ্রিল, ২০২০)